প্রশ্রয়

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

আজ জৈষ্ঠের পড়ন্ত অপরাহ্নে আকস্মাৎ ঈষান কোনে কালবৈশাখীর মেঘ এসে জমা হয়েছে। ক্ষণকাল পূর্বে সূর্যিদেব তার যে সম্মোহনী শক্তি দ্বারা সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকে আলোয় আলোকিত করে তুলছিল মেঘদূতের কাছে পরাস্ত হয়ে এখন সে আড়ালে লুকিয়েছে। সূর্যিদেব আড়ালে লুকোনোর কারণে সারা পৃথিবীতে ঈষৎ কালো অন্ধকার ক্রমে ঘনায়িত আকার ধারণ করেছে। হঠাৎ হাল্‌কা ঝড়ো হাওয়ায় অনেক দিনের জমানো রাস্তার ধূলিকণা এদিক-ওদিক উড়া-উড়ি করছে। দু'চারটি যে গাছপালা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তার শাখা-প্রশাখাগুলো বাতাসর সাথে ধাক্কা খেয়ে আনন্দে-আনোদলিত হয়ে নাচছে। হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম শব্দের সাথে শুরু হল কালবৈশাখির তান্ডবলীলা আর তার সাথে সাথে আকাশ ভেঙে নেমে এল বৃষ্টি। কর্মহীন এমন বৃষ্টিভেজা অপরাহ্নে স্মৃতির পাতা হাতড়ে ফিরছি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার ছেলেবেলার কথা। বোধকরি জৈষ্ট্যের শেষের দিকের কথা। বেশ কিছু গাছে আম পেকেছে আর বাকীগুলোও ঐ একই পর্যায়ে। এমনি সময়ে শুরু হল ঝঞ্চা বিক্ষুদ্ধ কালবৈশাখীর তান্ডবলীলা। কালবৈশাখীর বেগ চাবুকের মত আম্র শাখায় আঘাত হানতে ব্যাস্ত আর আম্রশাখাও অনন্যোপায় হয়ে তার সন্তানদের ফেলে দিতে লাগল। হাতে ঝুড়ি নিয়ে দৌড়ে একটি বাগানে প্রবেশ করলাম আম কুড়ানোর জন্য। যে বাগানে প্রবেশ করলাম সে বাগানটি বেশ নিরব। সহসা এখানে কেউ প্রবেশ করে না। মনের আনন্দে আম কুড়োচ্ছি। শেষকালে ঝুড়ি ভরে গেল কিন্তু আম পড়া অব্যাহত ভাবে চলতে থাকল। ঝুড়ি রেখে অন্য একটি গাছের তলে জমা করছি। কালবৈশাখী যখন শান্ত হয়ে এল তখন রেখে যাওয়া ঝুড়ির কাছে এসে দেখি ঝুড়ি নেই। এত কষ্টের সম্পদ কোন দুষ্টু তস্পর যেন নিয়ে গেছে, বিমর্ষ মন নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। এসে দেখি আমাদের পাড়ার মামুন বারান্দায় বসে। গামছার আঁচলে গুটিকয়েক আম বাঁধা দেখে তিরষ্কার করে বলে উঠল–সারাদিন জাল বেয়ে গুটি কয়েক পুঁটি মাছ। তুই ব্যাটা বোকার ডিম। আরে...বুদ্ধি থাকলে বসে থেকে সব পাওয়া যায়। –

মানে? – মানে হল এই যে আমি বসে থেকে এক ঝুড়ি আম কুড়িয়েছি আর তুই এত কষ্ট করে এক গামছাও হয়নি! – বসে থেকে ! কিন্তু কিভাবে? – উত্তরের বাগানে গিয়ে দেখি কে যেন এক ঝুড়ি আম কুড়িয়ে রেখেছে, ব্যাস, নিয়ে এলাম। – আরে ভাই, সেটা তো আমার।– অ্যাঁ..। – হ্যাঁ, ওগুলো আমার আম। এখন ভালয় ভালয় বলছি আমার আমগুলো ফিরিয়ে দাও।- এখন নয়। তবে রাতে ঠিক্ ঠিক্ তোকে একঝুড়ি আম এনে দেব। – রাতে দিনে বুঝি না। আমার আম চাই। সেদিন রাত্রিকালে পড়া শেষ করে সবেমাত্র ঘুমুতে যাচ্ছি, এমন সময় মামুন জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে আমাকে ডাকল,–শান্ত, দরজা খোল। তোর জন্য আম এনেছি। দেরি না করে ত্বড়িৎ গতিতে দরজা খুলে দিলাম।মামুন ঘরে সে ঢুকলো।

জৈষ্ট্যের গুমোট ভরা গরমে ওর গা দিয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরছে। সেদিকে ওর কোন খেয়াল নেই। পলিথিন ব্যাগের, একব্যাগ আম ঝুপ করে আমার সামনে রাখল। সেগুলো নিয়ে মেঝেতে বিছিয়ে আমি তো বিষ্ময়ে হতবাক। অত্যান্ত আশ্চর্য নেত্রে ওর দিকে চেয়ে বলে উঠলাম–একি! রাজার গাছের আম যে! কোথায় পেলে?

– চুরি করে এনেছি।

– চুরি করে...!

আমাদের পাড়ার রাজামিয়ার গাছের আম প্রত্যেকটি ছেলের কাছে ছিল অমৃতের মত। যে কেউ সে গাছের একটি আম খেতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করত, আর তার গল্প ও অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে বলত। সন্ধ্যাকালেই শুরু হয়ে যেত কে কার আগে চুরি করে আনতে পারে, সে প্রতিযোগিতা। কারও পক্ষে সম্ভব হত আবার কারও পক্ষে সম্ভব হতোনা কারন বাগানে পাহারাদার নিযুক্ত ছিল। অবশ্য দুষ্টু ছেলের দল, বাধা উপেক্ষা করে অত্যান্ত কৌশলে তা পেড়ে আনত। মাঝে মাঝে বিচিত্র কাহিনীও শোনা যেত অর্থাৎ চোরে চোরে টক্কর লাগত। একদল হয়তো গাছে চড়ে কাজ সমাধা করতে ব্যাস্ত আবার একই কাজের জন্য অন্যদল গাছে চড়তে ব্যাস্ত। ব্যাস্ উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ। এমন কাহিনী সম্পন্ন গাছের আম হাতের নাগালে পেলে কার না মন খুশীতে ভরে উঠে? খুশীতে গদ গদ হয়ে মামুনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। তারপর থেকে মামুনের সাথে সম্পর্ক বেশ জমে উঠল– অবশ্য তা আড়ালে। মামুন স্কুলে যেতনা কিন্তু আমি যেতাম। এ পার্থক্যের জন্যই আমার অভিভাবকগণ মামুনের সাথে আমাকে মিশতে দিতেন না। কিন্তু যাদের মধ্যে মিলিত হবার আকাংখা আছে তাদের কি আটকে রাখা যায়? তাছাড়া পাড়া গাঁ বলে কথা। সন্ধ্যার সময় সকলেই ঘুমিয়ে পড়ত। ঠিক সেই সুযোগে মামুন আমার ঘরে এসে ঢুকত। আসার সময় বিভিন্ন মৌসুমী ফল চুরি করে আনার কথা একদম ভুলত না, আমিও তা হাতের নাগালে পেয়ে খুশীই হতাম।

বেশ কয়দিন হয় মামুনের আর দেখা নেই। মনটা অস্থির হয়ে আছে এজন্য যে একয়দিন পাকস্থলীতে কোন ফলের খন্ড পড়েনি। একদিন সন্ধ্যাকালে হঠাৎ মামুন এসে হাজির। সাথে আমাদের পাড়ার কালু,সুমন এবং পাশ্ববর্তী গ্রামের বেশ কয়েকজন। এতগুলো ছেলে একসাথে ঘরে প্রবেশ করলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি ভেবে মামুন ঘরে না ঢুকে স্কুল ঘরের দিকে যেতে বলল। গিয়ে দেখি রান্নার আয়োজন চলছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ধানের ক্ষেতে যে সমস্ত পাতিঁহাস চরতে যেত তাদের মধ্যে থেকে একডজন চুরি করে এনেছে। সুযোগ বুঝে আটটি রাজাপুর হাটে বিক্রি করে দিয়েছে আর বাকীগুলো রান্না হচ্ছে। সংগে যে ছেলেগুলো ছিল তারা সকলেই এ কাজে শরীক হয়েছে। শুধুমাত্র আমিই তাদের খোশ মেহমান। রান্না শেষ হল কিন্তু খেতে পারলাম না, বুকের মাঝে কিসের যেন তীব্র ব্যাথা অনুভব হল। নিরীহ হাঁসগুলোর চেহারা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। ভাবতে লাগলাম যার হাঁস সে কতই না খোঁজা-খুঁজি করছে। নিরানন্দ মন নিয়ে না খেয়েই ঘরে ফিরে এলাম।

হাঁস চুরির কথা গোপন রইল না। পাড়ার সবচেয়ে বেশি মুরব্বী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আবুল মিয়ার হাঁস চুরি হয়েছে। বেচারা যেমনি নিরীহ তেমনি গরীব। এলোপ্যাথিক ঔষধের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসারে এমনিতে হোমিও প্যাথিক ঔষধ আর চলে না তার ওপরে পড়ল খাড়ার ঘা। ডাক্তার মশায় তখনই পঞ্চায়েত ডাকল। যথাসময়ে বিচার শুরু হল। বিচারের রায়ে ঘোষণা করা হল যে মামুন সহ যারা চুরি কাজে জড়িত ছিল তাদের সবাইকে পিঠমোড়া দিয়ে

বেঁধে পেটানো হবে। এ কথায় মামুনের বাবা হাসান মিয়া একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে সভার মধ্যেই চীৎকার করে বলে উঠল– কার এমন সাহস যে আমার ছেলের গায়ে হাত দেয়? বলি কয়টাকার হাঁস খেয়েছে যে আমি দিতে পারবনা? শেষ অবধি মামুনের বাবা হাসান মিয়া হাঁসের দাম পরিশোধ করে মামুনকে ছাড়িয়ে আনল। সে রাতেই ডাক্তার আবুল মিয়ার দফা-রফা অবস্থা হয়েছিল। বেচারা যেমন ছিল নিরীহ তেমন ভীতু। প্রতিশোধ নেবার জন্য মামুন তার সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে ধানের খড় দিয়ে বিকট মূর্তি বানিয়ে ডাক্তারের ঘরের দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। শেষ রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য বের হওয়ামাত্র দরজায় বিকট মূর্তি দেখে কাঁপতে কাঁপতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে ছিল। সুস্থ হবার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যত অনিষ্টই করুক মামুনের বিরুদ্ধে আর যাবেনা।

ক্রমে গ্রামে একটা পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। আজ এর ঘরের কবুতর তো অন্যঘরের মুরগী হারিয়েই চলল। সারাদিনের কর্মক্লান্তি শেষে সকলে যখন গভীর নিদ্রায় ব্যাস্ত তখনই কাজ সমাধা হত। গ্রামে এমনি অবস্থা বিরাজ করতে লাগল যে হাঁস-মুরগী আর কবুতর গুলো যেন হাওয়া হবার জন্যই জন্মেছে কে করছে তা কেউ জানে না। তবে সকলেই মামুনকে সন্দেহ করত কিন্তু প্রমানছাড়া মুখ ফুটে বলতে কেউ সাহস করত না। মামুন সহ বেশ কিছু ছেলেদের আচার-আচরণ বেশ পরিবর্তন সূচীত হতে লাগল। অল্প বয়সেই প্রকাশ্যে ধুমপান করতে লাগল আর জুয়া খেলা তো আছেই। মামুনের বাবাকে বিচার দিয়েও কোন ফল হতনা। উল্টো বিচারকারীকে তিরষ্কার শুনতে হত। পাড়াতে তারা ছিল যথেষ্ট প্রভাবশালী। কেউ কিছু বললে পাত্তাই দিতনা। উলেটা কর্কস স্বরে বলে উঠত– আমার ছেলে সিগারেট খাক্ না গাঁজা খাক্ তাতে কার কি? কারও পয়সা দিয়ে তো খাচ্ছে না। কার পাকা ক্ষেতে মই দিয়েছে তা দেখিয়ে দিক্। এমন কুৎসা রটনা করার মানে কি আমি বুঝিনা...? মামুনের বাবার আর বিচার করতে হল না। জমির আলীর বাড়িতে মুরগী চুরি করতে গিয়ে মামুন,কালু ও সুমন ধরা পড়ল। পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে দু'চারটি উত্তম-মধ্যম দিয়ে থানায় চালান করে দিল। সে যাত্রায় ও মামুনের বাবা রক্ষা করতে চেয়েছিল কিন্তু পাড়ার সকলের ঐক্যজোটের কাছে খুব সহজেই হার মানল। থানা ঘরটি ছিল আমাদের স্কুলের পেছনে। একদিন টিফিন পিরিয়ডে লুকিয়ে মামুনের সাথে দেখা করতে গেলাম অনুমতি নিয়ে ভেতরে ঢুকে মামুনের সামনে দাঁড়ানো মাত্র আমাকে দেখে কান্নার স্বরে বলে উঠলো–

শান্ত, তুই চলে যা ভাই। একটি চোরের সামনে বেশিক্ষণ থাকিস্‌নে। তোর পকেটের কলমটা আমায় চাবুক মারছে। আর শোন্ যদি পারিস আমার বাবাকে বলে দিস্ আমি এখানে বেশ আছি। আমাকে যেন ছাড়িয়ে না নেয়। সেদিন বিচারে যে রায় হয়েছিল তা যদি কার্যকর হত তবে আজ আর আমাকে এখানে থাকতে হতোনা-রে-ভাই। তুই যা ভাই। চলে যা..। সেদিন ফিরে এসে মামুনের বাবাকে কিছু বলিনি। বছর খানেক পরে জানতে পারলাম থানা থেকে ছাড়া পেয়ে মামুন কোথায় যেন চলে গেছে। মামুনের মা ছেলের জন্য হাহাকার করে দিন কয়েক শয্যাগত হয়ে পড়েছিল। মামুনের বাবা কোন কষ্ট পেয়েছিল কিনা তা কেউ জানেনা ॥

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি, নিতাই নগর, পোঃঅঃ – নগর, থানা – বড়ইগ্রাম, জেলা – নাটোর